গুণীজন
আমাদের প্রেরণার উৎস
www.gunijan.org.bd

বর্ষ : ৪ | সংখ্যা : ৭ | জানুয়ারি ২০১৩

হাসান হাফিজুর রহমান

হাসান হাফিজুর রহমানের বাবার গ্রন্থাগারে ছিল বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের বই, অন্যদিকে মায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকতো মুসলমান লেখকদের উল্লেখযোগ্য বই। ফলে পছন্দ-মতো বই পড়ার সুযোগ পারিবারিক সূত্রেই পেয়েছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। তাঁর বাবার একটা অদ্ভুত মানসিকতা ছিল, তিনি সরাসরি কোনোদিন বই পড়তে বলতেন না, কিন্তু এনে দিতেন। বই পড়ার ব্যাপারে এই পরোক্ষ প্রেরণা তাঁর জন্য ছিলো গৌরবের। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় দেশের বাড়িতে হাসান হাফিজুর রহমান একটি লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন। বিভিন্নভাবে তিনি বই সংগ্রহ করতেন আর পড়তেন।

বাল্যকাল থেকে সাহিত্যের প্রতি এই দুর্বার আকর্ষণই তাঁকে লেখালেখিতে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং পরবর্তীতে তিনি এদেশের অন্যতম কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। বাংলা কবিতায় রুচিবোধের পরিবর্তনে হাসান হাফিজুর রহমানের অবদান অসামান্য। তিনি একাধারে একজন বিশিষ্ট কবি, প্রগতিশীল আন্দোলনের একজন মহান কর্মী, মননশীল প্রবন্ধকার, খ্যাতিমান অধ্যাপক, বিশিষ্ট সাংবাদিক, কথাশিল্পী, সমালোচক এবং অসাধারণ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠক।

হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৩২ সালে ১৪ জুন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন সাত ভাই ও তিন বোন। হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৩৮ সালে ঢাকার নবকুমার স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে সরাসরি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৪২ সালে তাঁর বাবা ঢাকায় বদলি হয়ে এলে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৪৬ সালে মাধ্যমিক পাস করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে ১৯৫১ সালে তিনি বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রথম পর্ব এম.এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন।

অনার্স পরীক্ষা না দেয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেন : "সাহিত্য-খেলার মাতামাতিই আমাকে অনার্স না দেয়ার ব্যাপারে ভূমিকা রাখে। পরীক্ষার হলে গিয়ে পরীক্ষা না দিয়ে হল থেকে বেরিয়ে আসি। বাবা বাসায় ছিলেন। তাঁর মুখোভঙ্গিটা আমার এখনো মনে আছে। আমি যখন উচ্চারণ করলাম, 'বাবা পরীক্ষা দিলাম না।' তখন তিনি নির্বাক মূর্তির মতো বসে ছিলেন। বাবা আমাকে নিয়ে বড়ো কোনো প্রত্যাশা করেননি কখনো। একাডেমিক পড়া-লেখার চেয়ে বাইরের পড়া-লেখাকে তখন অধিক গুরুত্ব দিতাম।"

অনার্স শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িয়ে পড়েন তিনি এবং ফজলুল হক হলের মুসলিম লীগের ছাত্রফ্রন্ট থেকে নির্বাচনে এ.জি.এস. পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয় লাভ করেন। হাসান হাফিজুর রহমানের হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ সচেতন রাজনীতিসম্পৃক্তি না হলেও এই ঘটনার মধ্য দিয়েই তাঁর রাজনীতি সচেতনতার সূত্রপাত হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সংযুক্তির কারণে বি.এ. পড়ার সময় হলসমূহের নির্বাচনী ইস্তেহার লেখা এবং পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো তাঁর কার্যক্রম। যা তাঁর সাহিত্য সাধনার জন্য হয়েছিলো অনুকূল। কমিউনিস্ট পার্টির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ তিনি উপস্থিত ছিলেন- যেখানে জ্ঞান চক্রবর্তীর মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও উপস্থিত থাকতেন।

সমসাময়িককালেই তিনি আকৃষ্ট হন প্রগতি লেখক সংঘের কর্মধারার প্রতি। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের কার্যক্রম বিকাশ লাভ করে। সপ্তাহের প্রতি রবিবার সকালে মধুর ক্যান্টিনে সংঘের সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হতো। এ ক্ষেত্রে সক্রিয় সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, শামসুর রহমান খান, সুলতানুজ্জামান খান, অরবিন্দ সেন, মদনমোহন বসাক, আমিনুল ইসলাম, হাসান হাফিজুর রহমান, কল্যাণ দাশগুপ্ত, আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে তিনি এবং অলি আহমদ মধুর ক্যান্টিনে বসেছিলেন। অলি আহমদ হাসানকে বললেন, 'মেডিকেল কলেজের ওখানে ছেলেরা ইট-পাটকেল ছুড়ছে তুমি গিয়ে তাদের নিষেধ করো, নতুবা গুলি চলতে পারে।' হাসান গিয়ে তাদের নিষেধ করলেন, কিন্তু কেউ তাঁর কথা শুনলো না। কতক্ষণ পর দেখলেন, তিনি নিজেও ইট মারতে শুরু করেছেন। তারপর একটা টিয়ার গ্যাসের শেল তাঁর কাছে পড়লো, কিন্তু সেটা ফাটেনি। হাসান সেটা ঘুরিয়ে উল্টাদিকে মারলেন, তিন চার হাত দূরে সেটা পড়লো। এর তিন/চার মিনিট পরে গুলি চললো। কারা করছে বুঝতে পারলেন না হাসান। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগেরর বরকত ব্যারাকের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর থাই ভেদ করে গুলি চলে গেলো। লম্বা মানুষ। বসে থাকলেও গুলি তাঁর মাথায় লাগতো। হাসান তখন গেটে। হাসান এবং মুর্তজা বশীর অন্য একজন আহতকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

'অমর একুশে' কবিতাটি তিনি ১৯৫২-এর মার্চ/এপ্রিলের দিকে লেখেন। জুন মাসে কুমিল্লা সাহিত্য সম্মেলনে প্রথম জনসম্মুখে পাঠ করেন কবিতাটি। তাঁর সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনেই সেটা প্রথম ছাপা হয়। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়।

১৯৫৪, '৫৫ ও '৫৬ সালে হাসান হাফিজুর রহমান 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'-এর সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। এম.এ. পরীক্ষার পূর্বেই সাহিত্য-সাংবাদিকতায় প্রতি আগ্রহের কারণে তিনি ১৯৫২ সালে 'বেগম' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। তারপর সওগাত পত্রিকার দায়িত্বপূর্ণ সহকারী সম্পাদক হন। কেবল চাকরির জন্য নয়, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্যই তিনি পত্রিকায় চাকরি নিয়েছিলেন।

১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে কুমিল্লা শহরে অনুষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন'-এর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব তিনি দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। ১৯৫৪ সালে ডাকসুর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং এই দায়িত্ব পালনকালে তিনি 'Spectra' নামক ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। শিক্ষাজীবনের শেষ বছর ১৯৫৫ সালে তিনি আরও ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। 'সংস্কৃতি সংসদ', 'ড্রামা সার্কেল' প্রভৃতি সংগঠনের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৫ সালে এম.এ. দুই পর্ব এক সাথে পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন হাসান হাফিজুর রহমান। এ বছরই তিনি 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন।

১৯৫৭ সালে তিনি জগন্নাথ কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ড্রামা সার্কেল (১৯৫৭-৫৮) গঠিত হলে তিনি তার সভাপতি হন। 'সওগাত'-এর পর ১৯৫৭ সালে সিকান্দার আবু জাফর ও হাসান হাফিজুর রহমানের যৌথ উদ্যোগে 'সমকাল' নামে একটি মাসিকপত্র বের হয়।

হাসান হাফিজুর রহমানের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'সোনার বাংলা' পত্রিকায়, ১৯৪৯ সালে। ১৯৫০ সালে 'পূর্বাশা'-য় তাঁর কবিতা 'যেকোন সর্বহারার প্রার্থনা' এতো গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয় যে, একজন তরুণ কবি রাতারাতি আলোচিত হয়ে ওঠেন সাহিত্যাঙ্গনে। এরপর বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'-য় 'কোন একজনের মৃত্যুর মুহূর্তে' ছাপা হয়। ১৯৫০ সালে আশরাফ সিদ্দিকী এবং আবদুর রশীদ খান সম্পাদিত বিভাগোত্তর কালের প্রথম আধুনিক কবিতা সংকলন 'নতুন কবিতা'য় 'কোন একজনের মৃত্যুর মুহূর্তে' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর দাঙ্গাবিরোধী অনবদ্য গল্প 'আরো দু'টি মৃত্যু' ১৯৫০ সালে প্রথমে 'অগত্যা'য় এবং পরে 'দিলরুবা' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও আলাউদ্দিন আল আজাদ সম্পাদিত 'দাঙ্গার পাঁচটি গল্প' গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। এই গ্রন্থের জন্যে কৃষাণ চন্দরের একটি গল্পেরও অনুবাদ করেন তিনি। মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮) প্রকাশিত হয় তাঁর 'অস্বস্তি' নামক ছোটগল্প। 'জরিমানা' গল্প মুদ্রিত হয় 'সওগাত'-এর পৌষ ১৩৫৯ সংখ্যায়।

তাঁর কবিতার বইগুলি: ১৯৬৩ সালে 'বিমুখ প্রান্তর', ১৯৬৮ সালে 'আর্ত শব্দাবলী' ও 'অন্তিম শরের মত', ১৯৭২ সালে 'যখন উদ্যত সঙ্গীন', ১৯৭৬ সালে 'বজ্রচেরা আঁধার আমার', ১৯৮২ সালে 'শোকার্ত তরবারি', ১৯৮৩ সালে 'আমার ভেতরে বাঘ' ও 'ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী'।

এছাড়া ১৯৬৫ সালে সমালোচনা গ্রন্থ- 'আধুনিক কবি ও কবিতা', ১৯৭০ সালে 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' ও 'মূল্যবোধের জন্য', ১৯৭৭ সালে 'আলোকিত গহ্বর' ও ১৯৭৫ সালে 'দক্ষিণের জানালা' নামক প্রবন্ধ-নিবন্ধের বই, ১৯৫০ সালে 'দাঙ্গার পাঁচটি গল্প', ১৯৫৩ সালে '২১ শে ফেব্রুয়ারি' নামক তাঁর সম্পাদনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ছোট গল্পের বই হচ্ছে 'আরও দু'টি মৃত্যু'। তাঁর বহু রচনা ইংরেজী, উর্দু, ও রুশসহ অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

১৯৫৮ সালের ১৭ই এপ্রিল হাসান হাফিজুর রহমান সাঈদা হাসানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের দুই সন্তান- হাসান সাঈদ দিশা ও এশা হাসান মুন্নী।

বিবাহিত জীবনে হাসান হাফিজুর রহমানকে চাকরিহীন-বেতনহীন জীবনযাপন করতে হয়েছে একাধিকবার। তিনি যখন জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন তখন সেখানকার অধ্যক্ষ শিক্ষকদের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। সেই অধ্যক্ষের কার্যকলাপের বিরোধিতা করার ফলে হাসান হাফিজুর রহমানকে চাকরিচ্যুত করা হয়। পরে জগন্নাথ কলেজের নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ পুনরায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন হাসান হাফিজুর রহমানকে। তিনি ১৯৬৫ সালে কলেজ ছেড়ে তৎকালীন 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত উক্ত পদেই কর্মরত ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি যোগ দেন তাঁর পুরনো কর্মক্ষেত্র 'দৈনিক বাংলা'য় ('দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকার পরিবর্তিত নাম)।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে হাসান হাফিজুর রহমানের পরবর্তী কর্মজীবন শুরু হয়। স্বাধীনতার পর প্রকাশিত 'বিচিত্রা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকও ছিলেন তিনি। ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারি ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদমুখর শোভাযাত্রা বের করে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। মিছিলটি ঢাকাস্থ মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে কিশোর ছাত্র মতিউল কাদের নিহত হয়। এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে 'দৈনিক বাংলা' বিশেষ টেলিগ্রাম বের করে হাসান হাফিজুর রহমান যে নির্ভীকতা ও দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন, সাংবাদিকতার ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। তবে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তিনি 'দৈনিক বাংলা' থেকে চাকুরিচ্যুত হলেন। তারপর তাঁকে মস্কোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলর নিযুক্ত করা হয়- যার সাথে হাসান হাফিজুর রহমানের সারা জীবনের কাজের কোনো সঙ্গতি ছিলো না। উনিশ মাস মস্কোয় কাটানোর পর ১৯৭৪ সালের ১১ ডিসেম্বর হাসান হাফিজুর রহমান দেশে ফিরে এলেন।

মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হাসান হাফিজুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন শাখার ও.এস.ডি. হিসেবে থাকেন ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভাবনীয় রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর আড়াই বছর প্রায় চাকরিহীন-বেতনহীন জীবনযাপন করেন তিনি। ১৯৭৮ সালে হাসান হাফিজুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প'-এর প্রধান নিযুক্ত হন। তাঁর সম্পাদনায় ষোল খণ্ডে পরিকল্পিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়। এই সময়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৯৮৩ সালের ১৭ জানুয়ারি চিকিৎসার জন্য তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কোতে প্রেরণ করা হয়।

মস্কোর সেন্ট্রাল ক্লিনিক হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর প্রথম দিকে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেও পরে আবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল হাসান হাফিজুর রহমানের কর্মবহুল ও বৈচিত্র্যময় জীবনের অবসান ঘটে।

সাহিত্য ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য হাসান হাফিজুর রহমানকে ১৯৬৭ সালে লেখক সংঘ পুরস্কার, ১৯৬৮ সালে আদমজী পুরস্কার, ১৯৭১ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৭৬ সালে সূফী মোতাহার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার, ১৯৮২ সালে অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৮২ সালে নাসিরউদ্দিন স্বর্ণ পদকে ভূষিত করা হয়। ■

তথ্যসূত্র:
১. 'হাসান হাফিজুর রহমান', সম্পাদক- খালেদ খালেদুর রহমান, প্রকাশকাল- জুন ১৯৮৩।
২. 'হাসান হাফিজুর রহমান : জীবন ও সাহিত্য' লেখক- রফিকউল্লাহ খান, প্রকাশনী- বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ- জুন, ১৯৯৩।

লেখক: মৌরী তানিয়া

সম্পাদকীয়

আমাদের দেশে অনেক গুণী ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা সারাজীবন তাঁদের সৃজনশীল চিন্তা, মনন ও মেধা দিয়ে শান্তি, মানবতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছেন ও করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের লেখনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করছেন। অনেকে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমির এইসব গুণী ব্যক্তিবৃন্দকে নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করার একটি প্রয়াস 'গুণীজন' ট্রাস্ট। 'গুণীজন' ওয়েবসাইট www.gunijan.org.bd-এ রয়েছে আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের (শিক্ষা, সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, গণমাধ্যম, নারী অধিকার অন্দোলন, মুক্তিসংগ্রাম ইত্যাদি) গুণীজনদের বেড়ে ওঠার গল্প, বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র, সমসাময়িক বিষয় নিয়ে তাঁদের অডিও ও ভিডিও সাক্ষাৎকার। এছাড়া আরো রয়েছে গুণীজনদের লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

যেহেতু বাংলাদেশে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটছে ধীর গতিতে, তাই সিডি প্রকাশ ও স্কুল কর্মসূচিসহ বিভিন্ন মাধ্যমে 'গুণীজন'-এর প্রসার বাড়ানোর প্রয়াস চলছে। গুণীজন প্রকাশিত সিডিগুলো হলো- 'মহিমা তব উদ্ভাসিত', 'মহিমা তব উদ্ভাসিত- মুক্তিযুদ্ধ খণ্ড-১', 'মহিমা তব উদ্ভাসিত- মুক্তিসংগ্রাম'। সিডিগুলো পাওয়া যাবে- বনানীর অরণ্য ক্রাফটস লিমিটেডে, আজিজ সুপার মার্কেটের সুরের মেলা, বিসিএল সিডি কর্ণার ও পাঠশালায়; আইডিবি ভবনের ইপসিতা কম্পিউটারস-এ এবং হুমায়ুন রোডের ডি.নেট কার্যালয়ে।

'গুণীজন' কর্মসূচির আওতায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নতুন প্রজন্মের মাঝে বিতরণ করার জন্য ২০০৯ সাল থেকে 'গুণীজন' নামক পত্রিকাটি প্রকাশ করে আসছে। এবারের সংখ্যা সাহিত্যের চারজন গুণীজন হাসান হাফিজুর রহমান, সাঈদ আহমদ, ফয়েজ আহমদ ও আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ-এর জীবনী নিয়ে প্রকাশিত হলো।

গুণীজনদের পরিচিতি দেশব্যাপী বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হলো 'গুণীজন' নামক পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'গুণীজন' পত্রিকাটির পথচলা শুভ হবে এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে গুণীজনদের পরিচিতি ছড়িয়ে দেয়ার 'গুণীজন'-এর উদ্যোগ সফল হবে, এই কামনা করছি। ■

সাঈদ আহমদ

করাচিতে দুই কামরার বাসায় থাকেন সাঈদ আহমদ। সরকারি চাকরিতে একজন বাঙালী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি তখন কোণঠাসা অবস্থায়। ওই সময় করাচিতে গেলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে হাজির হলেন শিল্পী হামিদুর রাহমান ও মুর্তজা বশীর। এদের সাথে এসে যোগ দিলেন করাচির বিখ্যাত চিত্রকর সাদেকাইন। দুই কামরার বাসার পক্ষে যথেষ্ট ভীড়। সারা দিন পেইন্টিং, আড্ডা, হট্টগোল লেগেই আছে। বিরক্ত হয়ে পড়লেন সাঈদ আহমদ। অফিস থেকে বাসায় ফিরে নিজের কাজ কিছুই করা হচ্ছিল না তাঁর। একদিন তিনি রেগে গিয়ে অন্যদের বললেন, 'আমি দরজা বন্ধ করে কাজ করব। আপনারা হৈচৈ করবেন না।'

দরজা বন্ধ করে লিখতে বসে গেলেন তিনি। একটানা লিখলেন। লিখলেন ইংরেজিতে। প্রায় সাতদিনে এ লেখাটি একটি অ্যাবসার্ডধর্মী পূর্ণাঙ্গ নাটক হয়ে উঠল। নাটকের নাম রাখলেন 'দ্য থিং' । নাটকটি তিনি পড়ে শুনালেন জয়নুল আবেদিন ও হামিদুর রাহমানকে। জয়নুল আবেদীন শুনে মন্তব্য করলেন, 'এই নাটক খুব মুশকিলের। আমি তেমন বুঝতে পারি নাই। তবে আমি এটির প্রচ্ছদ করব।' শিল্পাচার্য এ নাটকের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু প্রচ্ছদটি আঁকা হয়নি তাঁর। সাঈদ আহমদের 'দ্য থিং' নাটকটি যখন লেখা হয় তখনও বাংলায়তো নয়ই উপমহাদেশেও অ্যাবসার্ডধর্মী কোনও নাটক রচিত হয়নি। সাঈদ আহমদের সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকার বাদল সরকার অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক 'এবং ইন্দ্রজিৎ' রচনা করেন আরও এক বছর পর ১৯৬২ সালে।

১৯৬১ সালে আমেরিকা থেকে করাচিতে আসে মেইন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মেইন মাসকুইয়ার্স' দল। তখন নাট্যকার হিসেবে এই দলের দলনেতা ড. হারশালের সাথে পরিচয় হয় সাঈদ আহমদের। করাচিতে এ দলের পরিবেশনায় 'দ্য থিং' মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি বাংলায় 'কালবেলা' নামে মঞ্চায়নের ব্যবস্থা নেয় ড্রামা সার্কল। গ্রুপ থিয়েটারের পথিকৃৎ নাট্যসংগঠনগুলোর অন্যতম ড্রামা সার্কল অ্যাবসার্ডধর্মী প্রথম নাটকটিকে মঞ্চে জীবন্ত করে তোলে। এক্ষেত্রে নাট্যনির্দেশক বজলুর রহমান ও নাট্যকার নিজে নাটকটির বাংলা অনুবাদ করেন। পরে নাট্যকার নিজে আরও পরিমার্জন ও সংশোধন শেষে এটিকে মুদ্রণ মাধ্যমের উপযোগী করে তোলেন এবং 'পরিক্রমা' নামের একটি সাহিত্যপত্রে সেটি প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে ড্রামা সার্কল ঢাকার তোপখানা রোডে তৎকালীন ইউসিস মিলনায়তনে এটি মঞ্চস্থ করে। 'কালবেলা' নাটকটি বেশকিছু ভাষায় অনূদিত এবং বিদেশে মঞ্চস্থও হয়েছে।

বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার ইতিহাসে সাঈদ আহমদ বিশেষ ব্যতিক্রম। দেশের নাটককে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে নিয়ে গেছেন তিনি। বাংলাদেশের আধুনিক নাট্যচর্চার গোড়াপত্তনকারীদের অন্যতম সাঈদ আহমদ উপমহাদেশের অ্যাবসার্ড নাটকের পথিকৃৎ। নাট্যকার সাঈদ আহমদ সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্র-সমালোচক, সংস্কৃতিবেত্তা, নির্মাতা এবং অভিনেতাও। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর নাটক অনূদিত হয়েছে। বিশ্বের নামিদামি অনেক একাডেমি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গনে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।

সাঈদ আহমদের জন্ম ১৯৩১ সালের ১ জানুয়ারি পুরনো ঢাকার ইসলামপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তিনি ঢাকার ঐতিহ্যবাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক ও ১৯৪৯ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে যুক্তরাজ্যে চলে যান। ১৯৫৬ সালে লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্স থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন তিনি।

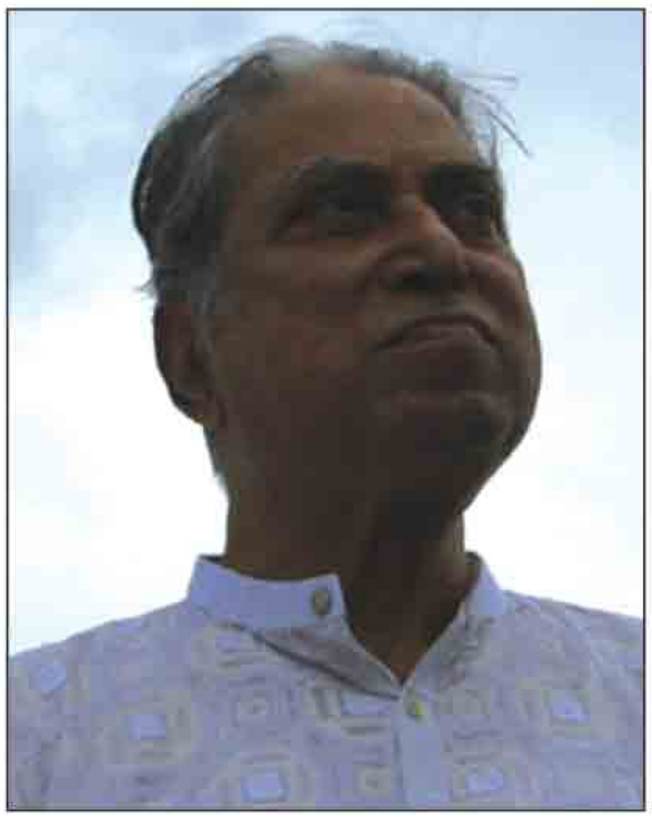

শিক্ষাজীবন শেষ করার পরপরই ১৯৫৬ সালে সরকারী চাকরিতে যোগ দিয়ে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান তিনি। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে নিষ্ঠার সাথে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। দীর্ঘ চাকরি জীবনের প্রথমদিকে পাকিস্তান ও পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি।

আজকের সাঈদ আহমদ নাটকের জন্য সমধিক পরিচিত হলেও শৈশব ও কৈশোরে এমনকি প্রথম যৌবনেও সঙ্গীত তাঁকে যতটা মগ্ন করে রেখেছিল নাটক ততটা মগ্ন করতে পারেনি। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই অসম্ভব টান ছিল সঙ্গীতের প্রতি। আবৃত্তি আর গান মিলে ছিল তাঁর ছেলেবেলা। দশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পলাতকা' আবৃত্তি করে প্রথম পুরস্কার বিজয়ী হয়েছিলেন তিনি। স্কুলের অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্যও তাঁর ডাক পড়ত।

ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান ছিলেন তাঁর সমবয়সী এবং বন্ধু। ওস্তাদ খাদেম হোসেন খান তাঁর ওস্তাদ। আয়েত আলী খাঁর কাছ থেকেও তিনি পরোক্ষ শিক্ষা পেয়েছেন। সাঈদ আহমদ বাংলাদেশের ২১ জন সঙ্গীতজ্ঞের জীবন ও কর্মের পরিচিতি তুলে ধরে 'বাংলাদেশের সুরস্রষ্টারা' নামের একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাঈদ আহমদ ১৯৫১ সালে পাশ্চাত্যের ধাঁচে একটি সঙ্গীতের দল গড়ে তোলেন। তাঁর সে দলের নাম ছিল 'সাঈদ আহমদ অ্যান্ড পার্টি'। বাংলাদেশের সঙ্গীতাঙ্গনে প্রথম তিনি ইলেক্ট্রিক গিটার নিয়ে আসেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত রেডিও পাকিস্তানে সেতার ও অর্কেস্ট্রা বাদন পরিবেশন করেন। লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্সে পড়ার সময় সাঈদ আহমদ সপ্তাহে তিন দিন মর্লি কলেজে মিউজিক শিখতেন সাঈদ আহমদ।

এছাড়াও বিবিসিতে সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন তিনি। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিবিসির সাথে লন্ডনের বিভিন্ন থিয়েটার ও কনসার্ট হলে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তিনি। ১৯৫৫ সালে প্যারিসের 'মুজি গিমেট'-এ আমন্ত্রিত হয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সাঈদ আহমদ। ফ্রান্স টেলিভিশনে সে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ভারতীয় নৃত্যদলের সাথে সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব হিসেবে সাঈদ আহমদ বিভিন্ন দেশ সফর করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময় মোকসুদ আলীর 'ইউরেকা' নাটকে প্রথম অভিনয় করেন। পরে তিনি শেক্সপিয়রের নাটক 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'সহ অভিনয় করেন 'অবাক জলপান', 'শেষরক্ষা' ইত্যাদি নাটকে। উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে ইউরোপে থাকার সময় নাটক দেখা ও অভিনয় দু'টোই করেছেন তিনি। এর পরে লন্ডনে থাকার সময় অভিনয় করেন 'আ কিং ইজ বর্ন' নাটকে। শ্বেতাঙ্গদের ভিড়ে এই নাটকে তিনিই একমাত্র অসবর্ণ অভিনেতা।

সাঈদ আহমদের লেখা দ্বিতীয় নাটক 'মাইলপোস্ট'। 'মাইলপোস্ট' নাটকটিও প্রথমে ইংরেজিতে লেখেন। এটির প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন নাট্যব্যক্তিত্ব আতাউর রহমান। ১৯৬৫ সালের মে মাসে বাংলা একাডেমী আয়োজিত নাট্য মৌসুমে 'সাতরং নাট্যগোষ্ঠী' বাংলা একাডেমী মিলনায়তনে এটি প্রথম মঞ্চস্থ করে। তাঁর লেখা তৃতীয় নাটক 'তৃষ্ণায়'। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এ নাটকটি রচনা করেন তিনি। প্রথমত এ নাটকটি বাংলায় লেখা হয় এবং পাশাপাশি নাট্যকার নিজে এটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। ১৯৬৯ সালে বাংলা একাডেমী 'তৃষ্ণায়' নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোককাহিনী শিয়াল ও কুমীর ছানার গল্পকে উপজীব্য করে এ নাটকটি রচিত। অস্তিত্বের সংগ্রামে সুচতুর শেয়ালের কাছে মার খাওয়া কুমীরের গল্প এ নাটকে বিনির্মিত হয়ে আরও ব্যাপকতর মাত্রা পায় এবং সামগ্রিক জীবনবোধ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়। বাংলাদেশে লোককাহিনী নিয়ে শিশুতোষ নাটকের বাইরে কোনও নাটক তিনিই প্রথম রচনা করেন। 'ব্যতিক্রম' নাট্যগোষ্ঠী নাটকটি বাংলাদেশে প্রথম মঞ্চস্থ করে।

১৯৬৭ সালে 'তৃষ্ণায়'-এর পাঞ্জাবি অনুবাদ 'জঙ্গল গা রাখা' মঞ্চস্থ হয় লাহোরে। লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি ও পেশোয়ারে-এর আগেও তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। নাটকটি দেখার জন্য প্রতিদিন দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় ছিল। এক সপ্তাহ চলার পর লাহোরের কমিশনার সাঈদ আহমদকে ডেকে পাঠালেন। কমিশনারের সাথে তাঁর বেশ বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু ওইদিন তিনি বন্ধুত্ব দেখালেন না। কী করলেন? তা সাঈদ আহমদের কাছ থেকেই শোনা যাক: 'কমিশনার গম্ভীর হয়ে বললেন, নাটকে আপনি ইয়াহিয়া খানকে কটাক্ষ করেছেন। এর সাজা আপনাকে নিতে হবে। আমি বললাম, আমি তো জেনে করিনি। তাছাড়া এ তো জানোয়ারকা কাহানি হ্যায় জানোয়ার বলতা হ্যায়। একটা নাটকের আর কী এমন দাম। কিন্তু এসব কথায় তিনি দমবার পাত্র নন। বহুত লোক দেখছে, অ্যান্টি প্রপাগান্ডা হয়ে যাচ্ছে। এ নাটক মঞ্চায়নের আগে আপনি অনুমতি নেননি। কেন অনুমতি না নিয়ে মঞ্চায়ন করলেন? বললাম, অনুমোদনের ব্যাপারটি আমার জানা ছিল না। সেবার এসব বলে পার পেয়েছিলাম এবং চাকরিটাও রক্ষা হয়েছিল। কিন্তু নাটকটির শো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ঠিকই।'

সাঈদ আহমদের চতুর্থ নাটক 'প্রতিদিন একদিন'। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় এ নাটক রচনা করেন ১৯৭৫ সালে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনে নেমে আসা চরম অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেন তিনি এ নাটকে। তাঁর লেখা পঞ্চম নাটক 'শেষ নবাব'। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর এ নাটক রচনায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি।

সাঈদ আহমদ বাংলাদেশের চিত্রকলা নিয়ে লেখালেখির ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা রেখেছেন। চিত্রকলার সমালোচনা শুরুই করেন তিনি। করাচিতে থাকাকালে তিনি চিত্রকলা নিয়ে লেখালেখির শুরু করেন । লন্ডনে থাকার সময় আর্টের ওপর একটা কোর্স করেন তিনি। চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন, হামিদুর রাহমান, মুর্তজা বশীর, সাকের আলী, সাদেকাইন প্রমুখদের সংস্পর্শ ও আড্ডা তাঁকে চিত্রশিল্প নিয়ে লেখার শক্তি দেয়।

সাঈদ আহমদ পাকিস্তানের ১৫ বছরের এবং পরে বাংলাদেশের ১৪ বছরের চিত্রকলার সুলোক সন্ধান নিয়ে সংকলন ও সংগ্রহ সম্পাদনা করেছেন। বাংলাদেশের চিত্রকলার উপর লেখা নিয়ে সাঈদ আহমদের বেশকিছু গ্রন্থ ও মনোগ্রাফ প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রশিল্পী হামিদুর রাহমানকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ (বাংলা ও ইংরেজিতে) রচনা করেছেন তিনি। চিত্রকলার বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ও বিবরণে সমৃদ্ধ এসব সমালোচনা কর্মে তিনি তাঁর শক্তিমত্তার প্রকাশ দেখিয়েছেন।

দৃশ্যনির্ভর মাধ্যমের জন্য করা সাঈদ আহমদের অন্যতম কর্ম 'বিশ্বনাটক'। বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য ১৯৮২ সাল থেকে টানা দশ বছর ধরে দর্শকনন্দিত এ অনুষ্ঠান করেছেন তিনি। বিশেষ একটি দেশের নাটকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করতেন তিনি। তারপর দর্শকদের একটি ভূমিকা দিয়ে ওই দেশের উল্লেখযোগ্য একটি নাটক দেখাতেন।

সাঈদ আহমদের স্ত্রী পারভীন আহমদ। বাংলাদেশের নারীদের সম্ভাবনা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, গ্রামীণ নারী শিক্ষা, নারী ও গ্রামীণ অর্থনীতি এবং হস্তশিল্প বিষয়ে পারভীন আহমদের বেশকিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা রয়েছে। পারভীন আহমদের লেখা সবই ইংরেজিতে।

সাঈদ আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও নাট্যকলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত। শিল্পকলা বিষয়ে পড়িয়েছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে।

শিল্প-সংস্কৃতির পথে জীবনব্যাপী যাত্রা সাঈদ আহমদের। অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দেশ ও বিদেশের বহু পুরস্কার, পদক, সম্মাননা পেয়েছেন তিনি- বাংলা নাটকে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৭৪ সালে 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার', ১৯৭৮ সালে সুফী মোতাহার হোসেন পুরস্কার, ১৯৮৩ সালে জার্মানির বার্লিন টিভি ড্রামা উৎসবে প্রিক্স ফিউচুরা পদক, ১৯৯৩ সালে ফরাসি সরকারের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'লিজন দ্য অনার', নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক ১৯৯৬ সালে দক্ষিণ এশিয়া পদক, ১৯৯৭ সালে মুনীর চৌধুরী পদকসহ আরো অনেক পুরস্কার লাভ করেন সাঈদ আহমদ। ২০১০ সালে তাঁকে নাট্যকলায় (মরণোত্তর) একুশে পদক দেওয়া হয়। নাট্যকার সাঈদ আহমদের সম্মানে ১৯৭৬ সালে ওয়াশিংটন ডিসির প্রখ্যাত নাট্যশালা এরিনা স্টেজের দর্শকাশনের একটি সারিকে নামাঙ্কন করা হয়।

সাঈদ আহমদ ২০১০ সালের ২১ জানুয়ারী ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। ■

সম্পাদক
ঊর্মি লোহানী

প্রকাশক
গুণীজন ট্রাষ্ট

মুদ্রণে
পাথওয়ে

অলংকরণ
মোঃ শাহজাহান কাজী

যোগাযোগ
৬/৮ হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ই-মেইল : info@gunijan.org.bd
ওয়েবসাইট ঃ www.gunijan.org.bd
ফোন ঃ +৮৮০২৮১৫৬৭৭২, +৮৮০১৮১৪৬৫২৪৯৬-৭
ফ্যাক্স ঃ +৮৮০২৮১৪২০২১

তথ্যসূত্র:
১. সাঈদ আহমদ এবং পারভীন আহমদের সাথে সরাসরি কথাবার্তা: সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৬
২. আলাপনে নাট্যকার সাঈদ আহমদ- সাক্ষাৎকার: শফি আহমদ ও হাসান শাহরিয়ার: নাট্যপত্রিকা থিয়েটারওয়ালা- ২০০৫
৩. নাট্যকার সাঈদ আহমদ: একটি মূল্যায়ন- মুস্তাফিজুর রহমান সৈয়দ: শিল্পকলা একাডেমি পত্রিকা
৪. বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা সৈয়দা খালেদা জাহান: বাংলা একাডেমি
৫. কালের ধুলোয় লেখা- শামসুর রাহমান
৬. বাংলাদেশের সুরস্রষ্টারা- সাঈদ আহমদ- সাহিত্য প্রকাশ
৭. শেষ নবাব- সাঈদ আহমদের নাটকের শামসুর রাহমান লিখিত ভূমিকা, পূর্বলেখ - শিল্পকলা একাডেমি

লেখক : ষড়ৈশ্বর্য মুহম্মদ

ফয়েজ আহমদ

ফয়েজ আহমদের অজপাড়া গ্রামের বাড়িতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও 'সওগাত'সহ আরো কয়েকটি পত্রিকা কলকাতা থেকে আসত। 'পরিচয়' ও 'কবিতার' মত সাহিত্য পত্রিকা অনিয়মিতভাবে হলেও তাঁরা পেতেন। 'শিশু সওগাত' পত্রিকাটি প্রকাশের পর তিনি তার গ্রাহক হয়েছিলেন। মাস শেষে উদগ্রীব হয়ে থাকতেন 'শিশু সওগাত'-এর নতুন সংখ্যার জন্য আর পিয়নকে তাগাদা দিয়ে অস্থির করে তুলতেন। 'সওগাত'-এ প্রকাশিত 'আসুন চুরি করি' শীর্ষক মুনীর চৌধুরীর একটি ব্যাঙ্গাত্মক লেখা পড়ে ফয়েজ আহমদ এতই আপ্লুত হয়েছিলেন যে তিনি কলকাতা গিয়ে তাঁর সাথে পরিচিত হবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন।

পত্রিকা পড়ার আগ্রহের পাশাপাশি ছেলেবেলা থেকেই লেখালেখির প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল খুব। ১৯৪৪ সালে ষোল বছর বয়সেই 'শিশু সওগাত'-এ ফয়েজ আহমদের লেখা 'নাম বিভ্রাট' শিরোনামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। এটিই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম মুদ্রিত লেখা। এলেখা প্রকাশের পর গ্রামে ও স্কুলে তাঁর পরিচিতি বৃদ্ধি পায়। এরপর তিনি কলকাতা যাবার বিষয়ে আর কারো কোন বাধা মানেননি। একদিন স্কুলের বেতন না দিয়ে ক্লাস পালিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন কলকাতার পথে। সাথে সম্বল ছিল শুধু স্কুলের বেতন, বই কেনার সামান্য টাকা আর শিশু সওগাতের সেই সংখ্যাটি যাতে তাঁর লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

ছেলেবেলা থেকে পত্রিকা পাগল ও লেখালেখির সাথে জড়িত ফয়েজ আহমদ পরবর্তী জীবনে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সবার কাছে পরিচিতি লাভ করেন।

ফয়েজ আহমদ ১৯২৮ সালের ২ মে বিক্রমপুরের বাসাইলডোগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি পঞ্চম। ষোলঘর স্কুলে যখন তিনি বড় হচ্ছিলেন, তখন তিনটি বিষয় তাঁকে প্রভাবিত করে। এগুলো হলো দেশ বিভাগ, ৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলন এবং বাংলা ৪২-৪৩ সালের মহামন্বন্তর। তখন থেকেই ভেতরে ভেতরে তিনি যেন একটি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর বাড়িতে ভাইদের মধ্যে ব্যতিক্রমী চরিত্র হয়ে ওঠেন।

ফয়েজ আহমদ সাহিত্যের প্রতি দুর্বার টানে ১৯৪৪ সালে ষোল বছর বয়সে স্কুল ফাঁকি দিয়ে কলকাতার 'সওগাত' অফিসে পৌঁছাবার পর প্রথমে তাঁর পরিচয় হয় বিখ্যাত দুই কবি আহসান হাবীব ও হাবীবুর রহমানের সাথে। তাঁরা তাঁকে আরো লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। 'শিশু সওগাত'-এ প্রকাশিত ফয়েজ আহমদের লেখাটি প্রকৃত পক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল বড়দের লেখা হিসেবে।

দেশ বিভাগের পর 'সওগাত' পত্রিকা ঢাকায় চলে আসে। 'সওগাত' অফিসেই নাসিরুদ্দিন সাহেবের সর্বাত্মক সহযোগিতায় প্রগতি ও মুক্তবুদ্ধির ধারক হিসেবে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের জন্ম হয়। ফয়েজ আহমদ সেসময় এই সংসদের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঢাকায় একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার অনন্য প্রয়াস নিয়েছিলেন। ফয়েজ আহমদের সাথে সাথে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে এ প্রতিষ্ঠানে যাঁরা প্রকাশ্যে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অধ্যাপক অজিত গুহ, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সৈয়দ নুরুদ্দিন, অধ্যাপক খান সারোয়ার মুরশিদ, আবদুল গণি হাজারী, মুনীর চৌধুরী, কবীর চৌধুরী, কবি শামসুর রাহমানসহ আরও অনেকে। এছাড়াও কয়েকজন উর্দু প্রগতিশীল কবি সাহিত্যিক ফয়েজ আহমদ ও তাঁর সংসদের ডাকে তাঁদের সাথে সামিল হয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ফয়েজ আহমদ সাহসিকতা ও দক্ষতার সাথে সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করেন।

ফয়েজ আহমদ ১৯৪৮ সাল থেকেই সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। যারা এই ভূ-খন্ডের সংবাদ মাধ্যমকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন ফয়েজ আহমদ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি 'ইত্তেফাক', 'সংবাদ', 'আজাদ' ও পরবর্তীতে 'পূর্বদেশ'-এ চীফ রিপোর্টার ছিলেন। তিনি সাপ্তাহিক 'ইনসাফ' ও 'ইনসান' পত্রিকায় রিপোর্টিং করেছেন। ১৯৫০ সালে 'হুল্লোড়' এবং ১৯৭১ সালে 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি জাতীয় সংবাদ সংস্থার প্রথম প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরে দৈনিক 'বঙ্গবার্তা'-র প্রধান সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন।

১৯৪৯ সালে যখন আওয়ামী লীগ গঠিত হয় তখন ফয়েজ আহমদ মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আওয়ামী লীগে যোগদান করার সুযোগ পেয়েও যাননি। তবে তখনকার মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে যে যুব সমাজ দাঁড়িয়েছিল তাঁদের অন্যতম হিসেবে বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পৃথক সত্তা নিয়ে ফয়েজ আহমদ আত্মপ্রকাশ করেন। ফয়েজ

আহমদের রাজনৈতিক জীবন প্রণালীতে ক্রমান্বয়ে শেখ মুজিব অঘোষিত ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি জানতেন, ফয়েজ আহমদ বাম দলের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল সুগভীর। ফয়েজ আহমদের ভাষায়- 'তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমি দুই রেললাইনের মতো পাশাপাশি গিয়েছি, কোথাও ক্রস করিনি।'

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার সময় ঢাকার পত্রিকাসমূহ ও সাংবাদিকদের প্রায় সবাই ছিলেন শেখ মুজিবের পক্ষে ও এই মামলার বিপক্ষে। এর মধ্যে 'আজাদ' পত্রিকা ছিল সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও সোচ্চার। ফয়েজ আহমদ তখন এই পত্রিকার চীফ রিপোর্টার হিসেবে অফিস থেকে এই মামলা কভারেজ করার দায়িত্ব পান। কিন্তু মামলা শুরু হবার আগের দিন পর্যন্ত সেনাবাহিনী রাজী ছিল না ফয়েজ আহমদকে এই মামলার রির্পোট করার অনুমতি দিতে। 'আজাদ' কর্তৃপক্ষ সেনাবাহিনীকে জানিয়েছিল যে, যদি তারা 'আজাদ' পত্রিকার মনোনীত সাংবাদিক হিসেবে ফয়েজ আহমদকে ট্রাইব্যুনাল কভার করার জন্য যেতে না দেয়, তবে 'আজাদ' পত্রিকা ট্রাইব্যুনালের কোন নিউজ ছাপবে না বা তার বদলে অন্য কোন সাংবাদিককেও প্রেরণ করবে না। মামলা আরম্ভ হওয়ার পর প্রথমদিন ভোরবেলা ফয়েজ আহমদ কার্ড পান। প্রথমদিন তারা ৬ পত্রিকার ৬ জন রিপোর্টার রিপোর্টিং করতে যান। কক্ষের সম্মুখেই ডিএফআইর লোকজন তাদেরকে কারো সাথে কথা না বলার জন্য সর্তক করে দেয়। জজের ডানপাশে এক চিলতে জায়গায় সাংবাদিকদের বসার জায়গা করা হয়েছিল। ফয়েজ আহমদ কক্ষে প্রবেশ করেই প্রথম চেয়ারটায় বসে পড়েন।

বিচার শুরু হওয়ার ৫ মিনিট আগে অভিযুক্ত ৩৫ জনকে কাঠের বেড়া দেয়া তাঁদের পাশের জায়গায় নিয়ে আসা হয়। সিরিয়াল অনুযায়ী প্রত্যেকের আসন নির্দিষ্ট ছিল। যেহেতু শেখ মুজিব প্রধান আসামী, সেহেতু তিনি এক নম্বরে। তাঁর আসন থেকে ফয়েজ আহমদের আসনের দূরত্ব ছিল দেড় হাত মাত্র। বিচার পর্ব শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যে ফয়েজ আহমদ তাঁর ডান উরুতে একটা আঘাত অনুভব করেন। সেই সাথে এক নম্র কণ্ঠস্বর ভেসে এল- এই ফয়েজ! ছয় রিপোর্টার প্রথমদিন ভয়ে ছিলেন কখন কি ভুল হয়ে যায় তাঁদের! সেজন্য তাঁরা জজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর মাঝে মাঝে কৌসুলিদের বক্তব্য শোনার জন্য তাঁদের দিকে ঘাড় ফেরাতেন। একটু পরে আবার তাঁর উরুতে শেখ সাহেব তাঁর খালি পাইপের ডগা দিয়ে কয়েকটি আঘাত করলেন। ফয়েজ আহমদ জজের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'মুজিব ভাই কথা বলা নিষিদ্ধ। পরে কথা হবে'। তিনি আবার ডাকলেন: 'এই ফয়েজ'! এবার একটু জোরে। তখন মাথা নিচু করে ফয়েজ আহমদ বললেন, 'কথা বলা নিষিদ্ধ মুজিব ভাই'। সেসময় শেখ মুজিব আশ্চর্যজনকভাবে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ফয়েজ, বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবের সাথে কথা বলতে হবে।' স্তম্ভিত বিচারকক্ষের বিচারকগণ, সকল আইনজীবী ও উপস্থিত দর্শকবৃন্দ সবাই অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে একথা শুনলেন!

সাংবাদিকতা করার সময় থেকে তিনি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট যেমন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছিল তেমনি ১৯৮৮ সালের মহাপ্লাবন, ১৯৯০ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাঁড়িয়েছিল। তের বছর দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার পর তিনি জোট থেকে পদত্যাগ করেন।

'৮০-র দশকে ফয়েজ আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি জাতীয় কবিতা উৎসবের প্রথম পাঁচ বছর আহ্বায়ক ছিলেন। এছাড়া ১৯৮২-তে বাংলা একাডেমীর কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু পরে এরশাদের সামরিক শাসনের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন।

কিশোর বয়স থেকেই তিনি বাম রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হন। ১৯৬০ সালে জেলে থাকা অবস্থায় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে সদস্যপদ দেয় এবং গুরুত্বপূর্ণ দু'টি কাজে নিয়োজিত করে। পার্টির নির্দেশে ১৯৫৪ সালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্টদের সহায়তায় বিনা পাসপোর্টে তিনি ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনে যোগ দেন। এজন্য তাঁকে 'হিরো' বলা হতো। এই সম্মেলনে ইরান থেকে ১৮ জন ও মেক্সিকো থেকে ৬ জন তাঁর মতো গুপ্তপথে ও পরিচয়ে সম্মেলনে যোগ দেন।

রাজনীতির জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে কারাবন্দী হয়েছেন। রাজনৈতিক কারণে তিনবার দীর্ঘ সময়ের জন্য তাঁকে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকতে হয়েছে।

তিনি 'মাষ্টারদা সূর্যসেন স্মৃতি কমিটির' প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ শক্তি এবং জামাতের বিরুদ্ধে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। এই কমিটি বাংলাদেশবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে ১৯৯২ সালে গণআদালত তৈরি করে। তিনি সেই গণআদালতের ১১ জন বিচারকের মধ্যে অন্যতম একজন বিচারক ছিলেন। এই গণআদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট যে ২৪ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল তিনিও তাঁদের মধ্যে একজন। এই মামলার আসামী হিসেবে তিনি পাঁচ বছর জামিনে ছিলেন।

এছাড়াও তিনি ঢাকার আর্ট গ্যালারী 'শিল্পাঙ্গণ'-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, প্রগতিশীল পাঠাগার 'সমাজতান্ত্রিক আর্কাইভ'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি ১৯৬৬ সালে পিকিং রেডিওতে বাংলা ভাষার অনুষ্ঠান শুরু করার জন্যে তিনবছর মেয়াদে নিযুক্ত হন। তিনি ঢাকা রেডিওতে ১৯৫২-৫৪ সালে 'সবুজ মেলা' নামের ছোটদের বিভাগটি পরিচালনা করতেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তিনি প্রেসক্লাবে ছিলেন। ভোর রাতে ট্যাঙ্ক দিয়ে শত্রুবাহিনী প্রেস ক্লাবের দোতালায় তাঁর আশ্রয় কক্ষে গোলাবর্ষণ করে। তিনি বাঁ পায়ের উরুতে আঘাত পেয়ে মেঝেতে পড়ে থাকেন। পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি সচিবালয়ে আশ্রয় নেন এবং ২৭ মার্চ সকালে চিকিৎসার জন্য বেরিয়ে যান। পরবর্তীতে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং সেখানে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের উপর পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে শেষ দিন পর্যন্ত লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবাসী সরকারে যোগ দেননি, কিন্তু প্রবাসী সরকারের সংবাদ সারাবিশ্বে প্রচারের জন্য সরকারের নেতারা তাঁর ওপর অনেকখানি নির্ভর করতেন। ঢাকা মুক্ত হবার সময় প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে ২২ ডিসেম্বর যে অগ্রবর্তী দলটিকে ঢাকায় পাঠানো হয় তিনি সেই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশেষ বিশেষ সময়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮৭ সালের দিকে যখন এরশাদের সামরিক শাসন বিরোধী গণআন্দোলন চলছে, তখন আন্দোলনকে বেগবান করার স্বার্থে ফয়েজ আহমদের উদ্যোগেই প্রথম বারের মতো দুই নেত্রী ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাসে মুখোমুখি বসে আলোচনায় বসেন। এই ঘটনাটি সে সময় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

কর্মজীবন এবং রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি তিনি প্রধানত শিশুকিশোরদের জন্য ছড়া ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর বইয়ের সংখ্যা প্রায় একশ। এর মধ্যে শিশুকিশোরদের জন্য বই রয়েছে ৬০টি। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী শিশুদের জন্য রচিত তাঁর চারটি বই ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। তাঁর লেখা ছড়া নিয়ে একটি আবৃত্তি ও সঙ্গীতের ক্যাসেট বেরিয়েছে। ফয়েজ আহমদের বইগুলোর মধ্যে 'মধ্যরাতের অশ্বারোহী' সবচেয়ে বিখ্যাত। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলে বিবেচিত। এছাড়াও তিনি চীনসহ বিভিন্ন দেশের পাঁচটি বই অনুবাদ করেছেন। এর মধ্যে হোচিমিনের 'জেলের কবিতা' উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ফয়েজ আহমদ বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ১৯৬৫ সালে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান পুরস্কার, ১৯৭৬ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮০ ও ১৯৮২ সালে ভাসানী স্মৃতি পুরস্কার, ১৯৮০ সালে অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে সাব্বির সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯১ সালে একুশে পদক, ১৯৯৭ সালে শিশু একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া নুরুল কাদের শিশু সাহিত্য ও মোদাব্বের হোসেন আরা শিশু সাহিত্য পুরস্কারসহ আরও অনেক পুরস্কারে ভূষিত করা হয় তাঁকে।

ফয়েজ আহমদ বিয়ে করেননি।

ফয়েজ আহমেদ ২০১২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ■

মূল লেখক: সৌমিত্র দেব
পুনর্লিখন : গুণীজন দল

গুণীজন
আমাদের প্রেরণার উৎস
www.gunijan.org.bd
বর্ষ : ৪ | সংখ্যা : ৭ | জানুয়ারি ২০১৩

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

১৯৩৪ সাল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য তখন পটে বসছে। বিশ্বের দিকে দিকে স্বাধিকার আন্দোলনের দাবীতে ব্রিটিশ শোষণে অতিষ্ট বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সোচ্চার হয়ে উঠছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অস্থির ডামাডোল পেরিয়ে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সমগ্র বিশ্ব তখন এক অস্থির আশংকায় কম্পমান। এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে ১৯৩৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জেলাশহর বরিশালে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর জন্ম। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, একজন আমলা, মন্ত্রী এবং সর্বোপরি একজন কবি।

বাংলাদেশের উত্তরে গারো পাহাড়ের কোলে গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে ছোট্ট একটি মফস্বল শহর। ব্রহ্মপুত্রের পলি বিধৌত এই শহরটির নাম ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহ শহরকে ডানে রেখে সোজা সমান্তরাল চলে গেছে ব্রহ্মপুত্র। তাঁর আগে শহরে ঢোকার পথে একটি বাঁক নিয়েছে নদীটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে এই শহরের মুন্সেফ ছিলেন আব্দুল জব্বার খান। তাঁর দ্বিতীয় ছেলে সেন্টু ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে পড়েন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রতিদিন বিশাল বিশাল প্রাচীন রেইন্ট্রি গাছের ছায়া আর পাখিদের সুমধুর কলকাকলির ভেতর দিয়ে তিনি স্কুলে যান। খুব শান্ত মিষ্টি একটি বালক। কোথাও কোন কোলাহল নেই। সকালে স্কুল আর বিকেলে বাড়ির ছাদে বসে বসে দূরের গারো পাহাড়টাকে দেখার বাসনায় মাথা উঁচিয়ে এক মনে ধ্যান করে বসে থাকেন। কোন কোন দিন বিকেলে সূর্যাস্তের আগে নদীর তীর ধরে হাঁটতে যান আপন মনে। অনেকটা পথ হেঁটে এসে নদীটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন পশ্চিম দিকে মুখ করে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে পশ্চিম দিকের অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। অনেকটা দূরে সূর্য তখন আপন মনে লালিমা ছড়িয়ে নদীর পেটের ভেতর ডুবে যেতে থাকে। বালক মুগ্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখতে থাকে। মনে মনে প্রার্থনা করে, এই অপূর্ব দৃশ্য যদি আমি চিরজাগরুক করে রাখতে পারতাম! এই দৃশ্য জাগরুক করার আকাঙ্ক্ষা, পাহাড় দেখার বাসনা বালক সেন্টুকে একদিন কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। আর সেদিনের সেই বালকটি হলেন আব্দুল জব্বার খানের দ্বিতীয় ছেলে কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। যাঁর ডাক নাম সেন্টু।

পিতার কর্মস্থল ময়মনসিংহে আবু জাফর ওবায়দুল্লার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু। শান্ত স্বভাবের আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ লেখাপড়ার প্রতি ছিলেন গভীর আগ্রহী। ১৯৪৮ সালে ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভর্তি হন ঢাকা কলেজের কলা বিভাগে। ১৯৫০ সালে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে অনার্স এবং ১৯৫৪ সালে মাস্টার্স কোর্স সমাপ্ত করে তিনি চাকরি জীবনে প্রবেশ করলেও লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন আজীবন। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে তিনি আরো শিক্ষা লাভের আশায় পাড়ি জমিয়েছেন সুদূর পাশ্চাত্যে। ১৯৫৮ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসনের উপর ডিপ্লোমা ডিগ্রি নেন। ১৯৭৪ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে গবেষণা করার জন্য ফেলোশিপ পান। এছাড়াও তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হনলুলুর ইস্ট ওয়েস্ট সেন্টারের ফেলো ছিলেন।

১৯৫৪ থেকে ১৯৯৭ এই ৪৩ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বহু বৈচিত্রময় পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে অধ্যাপনা পেশা ছেড়ে তিনি যোগ দেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে। ১৯৮২ সালে তিনি সচিব হিসেবে অবসর নেন এবং মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রী হিসেবে দুই বছর দায়িত্ব পালন করে ১৯৮৪ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অতিরিক্ত মহাপরিচালক হিসেবে যোগ দেন বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থায়। ১৯৯৭ সালে তিনি একই সংস্থা থেকে পরিচালক হিসেবে অবসর নেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ঢাকায় ফিরে একটি বেসরকারী সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবেও বেশ কয়েকদিন দায়িত্ব পালন করেছেন।

সাতচল্লিশোত্তর বাংলা কবিতায় আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ একটি বিশিষ্ট নাম। '৪৭-র দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের কবিতায় ফররুখ আহমেদ, আবুল হোসেন, আহসান হাবীব প্রমুখ যে নতুন কাব্যভূমি তৈরি করেছিলেন সেই কাব্যভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর কাব্য পরিভ্রমণ। তবে তা কখনোই মসৃণ ছিল না। দেশ বিভাগ, নতুন জাতীয়তাবোধের চেতনা এবং সেই চেতনার অপমৃত্যুর দংশনে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে তাঁর কবিহৃদয় এবং সে বেদনার পরিস্ফুটন ঘটে তাঁর কবিতায়। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ'র অবস্থান জীবনের ভিত্তিমূলে। সে অবস্থানটি যে কখনও টলেনি তার প্রমাণ তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'কমলের চোখ'।

দশক বিচারে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ মূলত পঞ্চাশ দশকের কবি। পঞ্চাশের দশকেই তাঁর কবি হিসেবে আবির্ভাব এবং এই দশকেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাতনরী হার' প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। সওগাত প্রেস থেকে বইটি প্রকাশ করে দিয়েছিলেন কবি হাসান হাফিজুর রহমান। তাঁর লেখালেখির পেছনে হাসান হাফিজুর রহমানের প্রেরণা ছিল অসামান্য। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রথম সংকলনে প্রকাশিত তাঁর কবিতা 'কোন এক মাকে' কবি হিসাবে তাঁর সোচ্চার আবির্ভাব ঘোষণা করে। তাঁর ঐ কবিতা ভাষা শহীদ দিবসে দেশের প্রতিটি শহীদ মিনার থেকে উচ্চারিত হয়। কবিতার জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন ছড়া ও গাঁথা কবিতার এক চিরায়ত লোকজ আঙ্গিক। আর এই আঙ্গিকের কারণেই প্রথম থেকেই তিনি তাঁর পঞ্চাশ দশকের অন্য সহযাত্রীদের থেকে ছিলেন আলাদা এবং স্বতন্ত্র। আর সে স্বাতন্ত্র্য তিনি তৈরী করেছিলেন এক ধরণের বাঙালিয়ানা আত্মস্থ করার ভেতর দিয়ে। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের ভেতর দিয়ে হাজার বছরের লোকজ ছড়ার ভাষায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন- কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে/আগুন লেগেছে,/ পলাশবনে লাল পরীরা/ নাইতে নেমেছে।/ কে দেখেছে? কে দেখেছে?/কন্যে দেখেছে,/নীল দীঘিতে স্বপ্ন হয়ে/ভেসে উঠেছে।/ কে বলেছে? কে বলেছে?/শালুক বলেছে,/এলো খোঁপা বাঁধতে গিয়ে/কন্যে কেঁদেছে।/কে শুনেছে? কে শুনেছে?/কেউতো শুনেছে,/সোনার কাঁকন খুঁজতে মেয়ে/জলে ডুবেছে। ('কুঁচবরণ কন্যে'/'সাতনরী হার')।

যদিও তিনি লোকজ ধারায় নিজেকে প্রকাশ করেছেন তথাপি তাঁর কবিতায় আধুনিকতা এবং আধুনিক কবিতার আঙ্গিকের কমতি ছিল না কোন ক্রমেই। কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সম্পর্কে তাঁর উত্তরসূরী এক কবি ইকবাল আজিজ এক প্রবন্ধে বলেছেন- "১৯৫৫ সালে প্রকাশিত 'সাতনরি হার' কাব্যগ্রন্থের এই কবিতাটি ('কুঁচবরণ কন্যে') পড়েই বোঝা যায়, লোকজ ছড়ার ঢঙে তিনি যেন কাহিনী বলতে চেয়েছেন সেই শুরু থেকে, আর পুঁথি কবিতার মধ্য দিয়ে কাহিনী বলে যাওয়ার প্রবৃত্তি বাঙালির হাজার বছরের সাংস্কৃতিক আচরণ ও অভ্যাসের সঙ্গে বিজড়িত অথচ তিনি আধুনিক কবি; কবিতার দর্শন, আঙ্গিক ও চেতনার দিক দিয়ে জসীম উদ্দীন কিংবা বন্দে আলী মিয়ার কবিতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা অবস্থানে। এখানেই তাঁর প্রতিভার মৌলিকত্ব: তিনি লোকজ ছড়া ও গাঁথা-কবিতার ভাষায় কথা বলেছেন কিন্তু তাঁর চেতনা সুস্পষ্টভাবে একজন আধুনিক মানুষের মননকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। এক্ষেত্রে ওবায়দুল্লাহকে সমকালীন আইরিশ কবি সিমাস হিনি কিংবা তাঁর বহু পূর্বের দুই মার্কিন কবি হুইটম্যান ও রবার্ট ফ্রস্টের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই কবিরা যেমন আধুনিক হয়েও তাঁদের লোকজ অভিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছেন অতিশয় নিপুণতার সঙ্গে; তেমনি ওবায়দুল্লাহও লোকজ ছড়া ও গাঁথা-কবিতার ঢঙে কবিতা নির্মাণ করেছেন।"

১৯৫৫ সালে প্রথম কাব্য প্রকাশ হলেও তাঁর দ্বিতীয় কাব্য প্রকাশ হয় দীর্ঘ বিরতিতে ১৯৭০ সালে। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'কখনো রং কখনো সুর'। এরপর ১৯৭৪ সালে বেরিয়েছে 'কমলের চোখ'। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর সর্বাধিক পাঠকপ্রিয় কবিতার বই 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি'। মূলত আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিজীবনের টার্নিং পয়েন্টও এই কবিতাটি। 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কাব্যের ভেতর দিয়ে তিনি তাঁর কাব্যভাবনা ও কাব্যদেবী সম্পর্কে ঋজু ভঙ্গিতে যে সরল স্বীকারোক্তি করেছেন, তা প্রকাশ করেছেন অপরূপ মায়াবী এক ঐন্দ্রজালিক ভাষাময়তায়- আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি/আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি/তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিলো/তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিলো।/তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন/ অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা বলতেন/তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।/জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা/কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।

বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর ছিল তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রসমাজের আন্দোলন যখন চরম আকার ধারণ করে তখন শাসক গোষ্ঠী ছাত্রদের মিছিলে ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিল বের করলে পুলিশ সেই মিছিলে গুলি বর্ষণ করে এবং শহীদ হয় রফিক, সালাম, জব্বার, বরকত প্রমুখ। ১৯৫২ সালে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ভাষা আন্দোলনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে, মিছিলে, মিটিঙে তাঁর উপস্থিতি ছিল সরব। '৫২-র সেই মিছিল, পুলিশের গুলিবর্ষণ, শহীদ হওয়া ছাত্রদের লাশ তাঁর মনে গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছিল। সেই বেদনা থেকেই পরবর্তীতে জন্ম নিয়েছিল তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কোন এক মাকে'। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাহিত্য আন্দোলনেও নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন তিনি। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের প্রগতিশীল কবিদের নিয়ে গঠন করেছিলেন পদাবলী নামের একটি সাহিত্য সংগঠন। পদাবলী বাংলাদেশের সাহিত্য সংগঠনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরে কবিতার অনেকগুলো ধারাবাহিক সেশনের আয়োজন করেছিল এই পদাবলী। শুধু তাই নয় তাঁরা একটি নতুনত্বও এনেছিলেন তাঁদের আয়োজনে দর্শনার্থী এবং শ্রোতাদের নির্দিষ্ট প্রবেশমূল্য পরিশোধ করে কবিতা ও কবিতার আলোচনা শুনতে হত। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এটি ছিল একটি বিরল ঘটনা।

তাঁর ভাইদের মাঝে রয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাপ্তাহিক 'হলিডে' সম্পাদক মরহুম এনায়েত উল্লাহ খান, বিশিষ্ট সাংবাদিক সাদেক খান, রয়েছেন বাংলাদেশের বাম রাজনীতির প্রবাদ পুরুষ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন। ছোট ভাই মাহীদুল্লাহ খান বাদল মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। তিনি আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। তাঁর এক বোন বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের সাহসী কণ্ঠস্বর সাবেক মন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বিয়ে করেছিলেন ১৯৫৮ সালে। তাঁর স্ত্রী মাহজাবীন খান। এই দম্পতির দুই ছেলে এক মেয়ে।

ব্রিটিশযুগে জন্ম ও বেড়ে ওঠা, পাকিস্তান যুগে যৌবন এবং বাংলাদেশে দেখেছেন নিজের পরিণতি, সফল পরিসমাপ্তি। এই ত্রিকালদর্শী মহতী পুরুষ, মহান কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ প্রায় এক বৎসর অসুস্থ থাকার পর ২০০১ সালের ১৯ মার্চ ৬৭ বছর বয়সে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। ■

তথ্যসূত্র:
১. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান।
২. রাশেদ খান মেনন ও কবি মুশারাফ করিমের স্মৃতি থেকে নেওয়া।

লেখক : এহসান হাবীব